বিবেকানন্দ-মূল্যায়নে বিপিনচন্দ্র পাল : একটি তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষ্য

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় ইতিহাসের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বিপিনচন্দ্র পাল অবশ্যই অন্যতম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি ধর্মোৎসাহী, সমাজসংস্কারক, সাংবাদিক, সুলেখক, ঐতিহাসিক—সর্বোপরি রাজনীতিবিদ ও সফল-স্বীকৃত বাগ্মী। তাঁর জীবনকাল ১৮৫৮ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত, ভূমিষ্ঠলগ্ন না হলেও তর্কসাপেক্ষে সময়টিকে আধুনিক ভারতবর্ষের বাল্য ও কৈশোর কাল বলা যায়। তিনি শুধুমাত্র এই সময়ের প্রত্যক্ষদর্শক নন, বিবিধ নিয়ামক ক্ষেত্রের অন্যতম বিশিষ্ট কুশীলবও বটে—সেইসঙ্গে কালের চলমান ইতিহাসের মূল্যবান ভাষ্যও তিনি রেখে গেছেন। আর একটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখ্য—বিপিন পাল স্বামী বিবেকানন্দের প্রাক্-অভ্যুত্থান এবং তৎপরবর্তী ঘটনাবলির সাক্ষাৎদর্শী ও কিয়দংশে লিপিকার। সেই বিবরণের মধ্যে স্পষ্ট বৈপরীত্য আছে—সেটি যেমন বিস্ময়ের, তেমনই তা সমসাময়িক কালের এক অমূল্য দলিলও বটে—সেইসঙ্গে রচয়িতার সততার অভ্রান্ত প্রমাণ। আমাদের মূল আগ্রহ সময়ের ব্যবধানে বিপিন পালের বৈপরীত্যধর্মী রচনাগুলি, তারাই এই প্রবন্ধের প্রাথমিক লক্ষ্যবস্তু—আদতে যা ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। পরিণত বয়সে বিপিন পাল দুটি খণ্ডে তাঁর ইংরেজি স্মৃতিকথা লিখেছিলেন, যার গুরুত্ব আজও ফুরোয়নি। এই রচনায় প্রয়োজনমতো আমরা সেই স্মৃতিকথার সাহায্য নেব। আপাতত ১৯৩২ সালে প্রকাশিত স্মৃতিকথার প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত Publisher's Note বা প্রকাশকের নিবেদন থেকে নির্বাচিত অংশ পেশ করব :

''শ্রীবিপিন পাল অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল বাংলাদেশের একজন অতি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব।... ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রণী নেতা হিসেবে তাঁর প্রভাব ছিল সারা দেশব্যাপী। ...নব্য ব্রাহ্ম সমাজের তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত শক্তিশালী সদস্য। একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ হিসেবে—রাজনৈতিক, সামাজিক, দর্শনবিষয়ক ও ধর্মীয় নানা গভীর সংকট ও সংশয়াদির সুনিপুণ ব্যাখ্যাতা হিসেবে, এবং

লাল-বাল-পাল

সাহিত্যের গভীর বিষয়াদি-কেন্দ্রিক নিপুণ রচনাশৈলীর জন্য আধুনিক ভারতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।... আমরা নিঃসন্দেহ—গত অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী আমাদের মাতৃভূমির সমাজজীবন ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নানা দিকের প্রতি মনোযোগী মানুষজন সাগ্রহে ও সপ্রশংসভাবে তাঁর এই স্মৃতিকথা অনুধাবন করবেন—কারণ আলোচিত সময়ের অন্যতম অগ্রণী কুশীলব হিসেবে এবং সমস্ত ঘটনাবলির বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণক্ষমতার জন্য বিপিনচন্দ্র পাল ছাড়া অন্য কেউ সম্ভবত এই কাজের জন্য সু-উপযুক্ত ছিলেন না।"[১]

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ অভিসন্ধির পথ বেয়ে যখন সারা দেশব্যাপী উত্তাল আন্দোলনের আবহ তৈরি হয় তখন ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তিনজন সর্বজনস্বীকৃত নেতার অভ্যুদয় ঘটে—বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল; একত্রে তাঁরা সম্বোধিত হতেন 'লাল-বাল-পাল' নামে। প্রধানত এই তিনজন নেতাই তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির উপর ব্রিটিশ আক্রমণকে সর্বভারতীয় লড়াইয়ের আঙিনায় নিয়ে যান। ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বাঁক, কারণ তিনটি ঘটনা এসময় ধারাবাহিকভাবে ঘটেছিল। এক, ভারতীয় কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে নরমপন্থী এবং চরমপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত—ফলশ্রুতি ১৯০৭ সালে জাতীয় কংগ্রেস দলের ভাঙন; দুই, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্রিটিশ দ্রব্যাদির বয়কট এবং সেই অনুষঙ্গে নানাবিধ প্রতীকী ও সরাসরি আন্দোলন; এই আন্দোলনের উপর নেমে আসা ব্রিটিশ অত্যাচারের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয়েছিল সশস্ত্র আন্দোলন—উঠে এসেছিলেন অসংখ্য অকুতোভয় দেশভক্ত ও আত্মবিলোপী কর্মী ও নেতৃবর্গ; তিন, এমত পরিস্থিতির মোকাবিলায় শুরু হয়েছিল দেশব্যাপী ব্রিটিশ ধরপাকড়—অবশ্যই অযৌক্তিক ও সহিংস। স্বদেশি আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ব্রিটিশের চরম দমনমূলক অভিযান ও ধরপাকড় এবং বিভিন্ন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গের কারারুদ্ধ হওয়ার কারণে ১৯০৮ সালের মাঝামাঝি স্বদেশি আন্দোলনের ধারা স্তিমিত হয়ে আসে। প্রায় অব্যবহিত কালে বিপিন পাল ও শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেন। ১৯১৪ সালে তিলকের কারামুক্তির পর ঘটনাক্রম এক নতুন মাত্রা নেয়। বিপিনচন্দ্র পাল সক্রিয় রাজনীতিতে পুনঃপ্রবেশ করলেও ১৯১৯-২০ সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করেন এবং রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে দাঁড়ান। এই পরবর্তী সময়েই অভিজ্ঞ মানুষটি মূলত গ্রন্থাদি রচনায় মন দিয়েছিলেন।

স্বদেশি আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯০৬ সালের ১৪ এবং ১৫ এপ্রিল বরিশালে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস অধিবেশন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সরকারিভাবে বঙ্গভঙ্গ বলবৎ করা

হয় ১৬ অক্টোবর ১৯০৫। তার মাত্র ছমাসের মধ্যেই এই অধিবেশন হয়। এই কারণেই বাংলার পূর্বপ্রান্তের ব্রিটিশ শাসকের প্রতিনিধিরা প্রথমাবধি এই অনুষ্ঠানের বিরোধিতার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। এমনকী 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সর্বাগ্রে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ অনুযায়ী[২] প্রথমদিন শান্তিপূর্ণ মিছিল যখন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ব্যতিরেকেই সভাভিমুখী তখনই শুরু হয় অকারণ পুলিশি তাণ্ডব। প্রতিরোধহীন জনগোষ্ঠীর আবেগমথিত 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি বিদেশি শাসকের প্রতিনিধিবর্গকে আরও বিচলিত করে। ফলে নেতৃবর্গ ও জনসাধারণের উপর তীব্র লাঠিচার্জের ফলে অসংখ্য মানুষ গুরুতর আহত হন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশ সাময়িকভাবে গ্রেপ্তার করে। তাঁর জরিমানাও ধার্য হয়। এইসব কারণে প্রথমদিন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ জনমণ্ডলীকে নিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। পরদিন সভার কাজ যথাসময়ে শুরু হলেও ব্রিটিশ কর্মকর্তারা সেটি জোর করে বন্ধ করে দেন। জানা যায়[৩] মূল অধিবেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল বরিশালের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেশ কিছু সভা করেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন আর এক নতুন চরমপন্থী নেতা—অরবিন্দ ঘোষ। পরের মাসে মহারাষ্ট্রের অগ্রণী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক কলকাতায় বিপুল জনগোষ্ঠীর সামনে একটি সভা করেন। কিছুদিন পরেই শুরু হয় কলকাতা কংগ্রেস—২৬-২৯ ডিসেম্বর, ১৯০৬। যদিও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন পাকাপাকি হয় ১৯০৭-এর সুরাট অধিবেশনে, কিন্তু তার সর্বৈব ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল কলকাতাতেই। এরপর থেকেই বাংলায় নরমপন্থী নেতা হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ স্বীকৃত হন, চরমপন্থী নেতা হিসেবে বিপিন পাল; মহারাষ্ট্রে একদিকে ছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও ফিরোজশাহ মেহতা, অন্যদিকে চরমপন্থী তিলক; পাঞ্জাবের চরমপন্থী নেতা ছিলেন লালা লাজপত রায়। আগেই বলেছি, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এইসময় থেকেই তিনজন চরমপন্থী নেতার নাম একযোগে উচ্চারিত হত—লাল-বাল-পাল। ভারতীয় স্বাধীনতার ১৯০৫—১৯১৯ মধ্যবর্তী অহিংস আন্দোলনের উপর অধুনা প্রকাশিত একটি গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যাব :

''Besides [Aurabindo] Ghosh and Gandhi, there were, at the national level, the trio of B. G. Tilak, Bipinchandra Pal and Lala Lajpat Rai–three men who came to be regarded popularly as the chief heroes of the Swadeshi Movement.''[৪]

একথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সুভাষচন্দ্র বসু রচিত 'The Indian Struggle' গ্রন্থে বিপিন পালের রাজনৈতিক ভূমিকার বিষয়ে বেশ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। একই গ্রন্থে বরিশাল অধিবেশন সম্বন্ধে উক্তির গুরুত্বও অনস্বীকার্য : ''বরিশালে ১৯০৬ সালে মানুষের শান্তিপূর্ণ মিছিল ও জমায়েত বিশৃঙ্খল করার উদ্দেশ্যে যখন নৃশংস শক্তি প্রয়োগ করা হয়—মানুষ বুঝতে পারে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন আর যথেষ্ট নয়। এই তীব্র হতাশা থেকেই তরুণ সমাজ হাতে তুলে নেয় বোমা ও বন্দুক।''[৫]

বিপিনচন্দ্র পালের রাজনৈতিক জীবন ও অভিজ্ঞতার পাশাপাশি তাঁর ধর্মীয় অনুসন্ধিৎসার দিকটিও সংক্ষেপে দেখে নেব। কারণ এই দুই পটভূমিকা ছাড়া তাঁর বিবেকানন্দ-মূল্যায়নের ঐতিহাসিক গুরুত্বের আন্দাজ পাওয়া সম্ভব নয়।

দুই

জন্মস্থান শ্রীহট্ট বা সিলেট থেকে ১৮৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিপিন পাল কলকাতায়

আসেন—উদ্দেশ্য বিদ্যাচর্চা। এ ছিল এমন এক সময় যখন এই শহরে নানাবিধ পরিবর্তনের হাওয়া বইছে—যা তৎপরবর্তী দেশের রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পাকাপাকি ছাপ ফেলবে। সময়টিকে চিহ্নিত করে তাঁর স্মৃতিকথায় বিপিনচন্দ্র লিখছেন :

''ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে এইকালে আচার-আচরণ ও কথাবার্তার মধ্যে ক্রমেই স্বাধীন ও আত্মসচেতনতার এক নব উন্মেষ পরিলক্ষিত হতে শুরু হয়।... এরই পাশাপাশি কেশব সেনের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক সাম্যের সপক্ষে এক নতুন ধর্মমত ঘোষণা করেছিল, যা জাতীয় চেতনার উন্মেষলগ্নে তরুণ বাংলার রাজনৈতিক জীবন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর জোরালো প্রভাব ফেলেছিল।''[৬]

সুতরাং তাঁর সমসাময়িক তরুণগোষ্ঠীর অনেকের মতোই বিপিন পালও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হলেন—যোগ দিলেন কেশব সেনের নেতৃত্বাধীন Brahma Samaj of India, অর্থাৎ ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজে। সময়কাল ১৮৭৫ সাল। ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বিভাজনের তখনও কিছুদিন দেরি ছিল। তাঁর ব্রাহ্মমতে দীক্ষা হয় ১৮৭৫ ও ১৮৭৭ সালের মধ্যবর্তী কোনও এক সময়ে। তবে তিনি জানিয়েছেন যে প্রথমাবধি তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। সুতরাং ১৮৭৮ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ যখন কেশব সেনের ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিখণ্ডিত হয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সৃষ্টি হল, এবং পূর্বোক্ত কেশব সেনের শাখাটি পরিচিত হল নববিধান বা New Dispensation নামে, তখন বিপিন পাল নতুন গোষ্ঠীতেই যোগ দিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেও বিপিন পালের ধর্মপিপাসা ক্ষান্ত হয়নি। ১৮৭৬ সালে ভারতবর্ষে থিওজফিকাল সোসাইটির গোড়াপত্তনের পর তিনি নিজের মতো করে সেই গোষ্ঠীর দিকেও আকৃষ্ট হন। এমনকী পরে তাঁকে আমরা অ্যানি বেসান্ত-এর জীবনী লিখতেও দেখেছি। তাঁর বয়ান অনুযায়ী :

''প্রথমাবধি যবে থেকে তিনি নাস্তিকতা ও ধর্মবিষয়ক মুক্তচিন্তার জন্য সর্বত্র পরিচিত হলেন, তখন থেকেই আমি শ্রীমতী বেসান্তের কার্যাবলির প্রতি মনোযোগী। সমকালীন ঘটনা হিসেবে তাঁর থিওজফি ধর্মমত অবলম্বনের কথা আমি পড়েছি, এবং যখন তিনি প্রথম কলকাতায় আসেন তখন আমি তাঁর বক্তৃতাও শুনেছি—তখন থেকেই তাঁর প্রচারমূলক কাজের বিষয়ে আমি জানতাম।... তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছি, এমনকী সর্বোপরি আমাদের উভয়ের লক্ষ্য যেখানে অভিন্ন মনে হয়েছে সেখানে আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতা অনুযায়ী আমি তাঁর সতীর্থ হিসেবে কাজও করেছি।''[৭]

তবে বিপিন পালের একদিকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আনুগত্য এবং অন্যদিকে থিওজফিকাল সোসাইটির কার্যাবলি এমনকী প্রচারিত তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও তাঁর হৃদয় গভীরতর আশ্রয় পেয়েছিল বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে। সেই আশ্রয় তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে। বিপিন পালের রচনায় সেকথার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে : ''...আমার গুরু পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অনুপ্রেরণায় আমার অন্তর্জগতে এক নতুন অধ্যায়ের উন্মোচন হয়েছে।''[৮] একথা অনেকেই জানেন, কেশব সেনের সঙ্গেও বিজয়কৃষ্ণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিপিন পাল বলেছেন : ''বিজয়কৃষ্ণের স্থান ছিল কেশবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে। কেশব তাঁকে নির্বাচন করেছিলেন তাঁর ধর্মান্দোলনের মধ্যে ভক্তি বা ঈশ্বরপ্রেমের প্রতীক ও প্রচারকরূপে।... বুদ্ধের কাছে আনন্দ যেমন ছিলেন, বিজয়কৃষ্ণও কেশবের কাছে ছিলেন ঠিক তেমনই।''[৯] একই গ্রন্থের অন্যত্র আমরা বিপিনচন্দ্রকে এও বলতে শুনেছি যে,

''কেশবচন্দ্র সেন এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উভয়েই বাংলাদেশে ভক্তি আন্দোলনে নবধারার সঞ্চারক।''[১০] সুতরাং সম্ভবত এই কারণেই ১৮৯৫ সালে বিজয়কৃষ্ণের কাছে প্রথামতো দীক্ষা গ্রহণ সত্ত্বেও বিপিন পালের ব্রাহ্মসমাজভুক্ত থাকতে কোনও অসুবিধা হয়নি। তিনি নিজেও জানিয়েছেন : ''দীক্ষাগ্রহণ আমার ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার পথে অন্তরায় হয়নি... আমার বাহ্যিক জীবনে আমার দীক্ষা গ্রহণ বস্তুত কোনও তফাৎ ঘটায়নি।''[১১]

লক্ষ করলে দেখা যাবে, বিপিন পালের দীক্ষা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগের প্রায় বছর ছয়েক পরের ঘটনা হলেও তিনি পরবর্তী কালে ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন। সুতরাং আমরা ধরে নিতেই পারি বিপিন পালের ধর্মজীবনের যাত্রাপথ বৈষ্ণবধর্ম ও বিজয়কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক আশ্রয়ে সমাপ্ত হলেও, ব্রাহ্মসমাজ ও থিওজফিকাল সোসাইটির সান্নিধ্যও তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিধি শুরুতেই আলোচিত। সংগত কারণেই দেশি-বিদেশি অসংখ্য গবেষণাগ্রন্থ দীর্ঘদিন যাবৎ বিপিন পালের রচনাদি, তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবন, এবং তাঁর ধর্মচর্চার ইতিহাসের প্রতি ধারাবাহিকভাবে মনোযোগী। তাঁর বিবেকানন্দ-মূল্যায়নের প্রসঙ্গে যাওয়ার প্রাক্‌কালে এই উল্লেখগুলি জরুরি। জরুরি আর একটি প্রসঙ্গ—সেটি স্বামীজীর ১৮৯৭ সালে ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া হলে প্রদত্ত বক্তৃতা—'My Plan of Campaign'। এই বক্তৃতায় স্বামীজী সরাসরি থিওজফিকাল সোসাইটির সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ছিল দুটি দিক। প্রথমত, বিদেশের মাটিতে তাঁর প্রতি এই গোষ্ঠীর তীব্র বিরোধিতার কথা তিনি বলেছিলেন, যে-বিরোধিতার মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর জনপ্রিয়তা ও কর্মোদ্যোগের সমূল বিনাশ। দ্বিতীয়ত, থিওজফিক ধর্মতত্ত্বের মধ্যে miracle বা অলৌকিক ঘটনাদির উল্লেখও তিনি করেছিলেন। স্বদেশের জন্য স্বামীজীর সর্বোচ্চ স্বপ্ন ছিল 'Man-making', এক কথায় মানুষ গড়ার উদ্যোগ। তিনি চেয়েছিলেন নিঃস্বার্থ অকুতোভয় মানুষ, তাই অদ্বৈতের বাণী ছিল তাঁর শিক্ষার মূল সুর—সেখানে অলৌকিকতার কোনও স্থান ছিল না। ভারতবর্ষে সেইকালে থিওজফিকাল সোসাইটির প্রভাবের কথা তিনি জানতেন। তাই বলেছিলেন তাঁর বক্তব্যের ফলাফলে তিনি চিন্তিত নন। কারণ তিনি সন্ন্যাসী, সেই অভিন্ন সন্ন্যাসী যিনি চার বছর আগে শুধুমাত্র একটি লাঠি আর কমণ্ডলু নিয়ে মাদ্রাজ শহরে এসেছিলেন। বলেছিলেন—সেদিনের সেই বিপুল পৃথ্বী সর্বদাই তাঁর সামনে উন্মুক্ত। এই বক্তৃতার তাৎক্ষণিক ফল ফলেছিল, স্বামীজীর অপরিসীম জনপ্রিয়তার উপর বিরুদ্ধ স্রোতের ঢল নেমেছিল। সারা ভারতের কথা থাক—কলকাতায় এই প্রভাব ছিল সর্বাধিক, এমনকী থিওজফিকাল আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল মাদ্রাজের থেকেও বেশি। তার প্রধান কারণ দুটি। প্রথম, এই ঘটনা প্রায় বিপরীত দুই গোষ্ঠীকে একসূত্রে বেঁধেছিল—যার একদিকে ছিলেন বিবেকানন্দ-বিরোধী নববিধান গোষ্ঠীর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, তাঁর উদ্যোগের মূলে ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থ; অন্যদিকে ছিলেন খ্রিস্টান মিশনারিরা, তাঁদের উৎসাহের মূলে ছিল আর্থিক স্বার্থক্ষয় এবং স্বামীজী ছিলেন সেটির কারণ; দুই, অন্যতর কারণাদিতে কলকাতার কিছু

মানুষ, যাঁদের মধ্যে বিশিষ্টজনেরাও যে ছিলেন না তা নয়, বিবেকানন্দের অকস্মাৎ আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার হেতু কমবেশি তাঁর বিরোধিতায় নেমেছিলেন। তাই উল্লিখিত বক্তৃতায় সরাসরি থিওজফিকাল সোসাইটির বিরুদ্ধে স্বামীজীর সাহসী অভিযোগ বহু মানুষের কাছে অত্যন্ত সুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল। বিপিন পাল এই ঘোলা জলে মাছ ধরা গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন না বলেই মনে হয়; তবু এই বক্তৃতা তাঁর মতামতকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে এই কারণে এই প্রসঙ্গ এখানে এনেছি। তবে এও বলা প্রয়োজন—থিওজফিক আন্দোলন সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যের গুরুত্ব ও যাথার্থ্যের দিকটি সাব্যস্ত হতে খুব বেশি সময় লাগেনি।

তিন

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর ইংরেজি সাপ্তাহিক 'নিউ ইন্ডিয়া' শুরু করেন ১২ আগস্ট ১৯০১। এই কাগজে ৭ জুলাই ১৯০২ প্রকাশিত স্বামীজীর অবিচুয়ারি নোট বা শোক-সংবাদের নির্বাচিত অংশ প্রথমে দেখব। কিন্তু তার আগে তাঁর সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতার কথা বলা প্রয়োজন। যতদূর জানা যায় শ্রীহট্টে থাকাকালীন তাঁর হাতে খড়ি বাংলা সাপ্তাহিক 'পরিদর্শক' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে। দুবছর পর তিনি 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' কাগজের সহ-সম্পাদক হন, এটি তৎপূর্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ছিল—তখন নাম ছিল 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন'। ১৮৮৭ সালে বিপিন পাল জনপ্রিয় ত্রি-সাপ্তাহিক 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সহ-সম্পাদনার চাকরি নিয়ে লাহোরে যান। তবে বেশিদিন সেখানে তিনি থাকেননি, বছরখানেকের মধ্যেই ফিরে আসেন। ১৮৯২ সালে শুরু করেন বাংলা মাসিক পত্রিকা 'আশা', পরে 'কৌমুদী' নামে একটি পাক্ষিক। এছাড়া আরও নানা পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, যেমন সম্পাদনাসূত্রে—'দি হিন্দু রিভিউ', 'দি ডেমোক্রেট', 'দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট' ইত্যাদি। এছাড়া বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে বহু গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা, এবং সেগুলি আজও আগ্রহী পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষকের মনোযোগের বস্তু।

'নিউ ইন্ডিয়া' কাগজে স্বামীজীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না তার প্রধান কারণ এটির প্রতিষ্ঠাকাল স্বামীজীর তিরোধানের মাত্র কিছুদিন পূর্বের ঘটনা। কিন্তু এই সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১০ জুলাই ১৯০২ তারিখে প্রকাশিত তাঁর দেহান্তের সংবাদটি গুরুত্বে অসীম। সেটির মধ্যে তাঁর অকস্মাৎ তিরোধান তাঁর বিপুল-সংখ্যক ভারতীয় ও আমেরিকান অন্তরঙ্গ ও গুণমুগ্ধ মানুষকে কী গভীর শোকার্ত ও বেদনাক্লিষ্ট করেছে তার উল্লেখ বিপিন পাল করেছিলেন। তিনি একথাও স্বীকার করেছিলেন যে বিবেকানন্দ ছিলেন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী, এবং তাঁর ছিল এক তীব্র আকর্ষণী ব্যক্তিত্ব। যার ফলে তিনি যেখানেই গেছেন সেখানে প্রভূত মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অতীব বিস্ময় আর গুণমুগ্ধতা। কিন্তু এসব বলার পরেও বিপিন পাল বিবেকানন্দের অক্ষমতার কথা বলতে দ্বিধা করেননি :

''শিক্ষক হিসেবে নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা বা অধীত জ্ঞান অপেক্ষা বিবেকানন্দের জোরের জায়গা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তি। প্রকৃতপক্ষে দর্শনবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে তাঁর অভাব ছিল নিজস্ব কোন ধারার; তবে সম্ভবত সেটিই তাঁকে বিশ্বের দুই গোলার্ধের সেই সব মানুষদের কাছে এই বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী করেছিল, যারা সততই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বদের উচ্চারিত বাক্যাদির দ্বারা ভেসে যেতে প্রস্তুত।''[১২]

এরপর বিপিন পাল কয়েকটি প্রশংসাবাক্য ব্যয় করেই প্রতিতুলনার আশ্রয় নিয়েছেন :

''বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা বিবেকানন্দের ছিল, এবং তা অত্যন্ত

ব্যতিক্রমী মাত্রাতেই ছিল—যদিও তাঁর মধ্যে একজন প্রকৃত বক্তার অন্যান্য গুণাবলির অভাব ছিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে বিবেকানন্দের মতো আর কেউ ছিলেন না কেশব সেন চলে যাওয়ার পরে, যিনি (কেশব সেন) আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বিগত শতাব্দীতে শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তবে বিবেকানন্দ কোনও নিজস্ব চিন্তাপ্রণালী রেখে যাননি, যদিচ তাঁর মধ্যে ব্যাবহারিক বিশ্বের কর্মদক্ষ মানুষের গুণাবলি ছিল...।"

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে তাঁর দেহান্তের অব্যবহিত কালে এই ছিল বিপিন পালের আপাত-সুচিন্তিত মতামত। কিন্তু এই লিখনের বছর তিনেক আগে আর একটি রচনার কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে বিপিন পাল কিছুটা অন্য অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন। এটি তিনি প্রথমবার বিদেশে থাকাকালীন ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকার লন্ডন-পত্রকার হিসেবে লিখেছিলেন :

''ভারতবর্ষে কোনও কোনও মহলে এমন একটি ধারণা আছে যে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার সম্বন্ধে তাঁর বন্ধুদের বক্তব্য অত্যধিক অতিরঞ্জিত। আমেরিকার বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না, কিন্তু এখানে ইংল্যান্ডে আমার মনে হয় অনুগামী না হলেও তাঁর একটি মোটামুটি বৃহৎ সহানুভূতিশীল গোষ্ঠী আছে। আমার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় নানা মানুষের দেখা হয়েছে যাঁরা ওঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।... আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এখানে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন শাস্ত্রাদির অন্তর্গত উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি মানুষের চোখ খুলে দিয়ে তিনি প্রকৃতই একটি কাজের কাজ করেছেন। ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে যোগাযোগের তিনি একটি স্বর্ণ-সম্পর্ক নির্মাণ করে দিয়েছেন।... শিক্ষিত ও উদারমনস্ক ইংরেজরা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মাদর্শের বিষয়ে যেকোনও বক্তব্য কী পরিমাণ আগ্রহের সঙ্গে অনুধাবন করেন আমি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।"[১৩]

এই রচনার পর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। বিপিন পাল রাজনীতি থেকে সরে এসেছেন, তাঁর পরিপক্ক মন ও মনন নিয়োজিত হয়েছে মূলত বিবিধ রচনাদি ও স্মৃতিচারণে—সম্ভবত অধীত অভিজ্ঞতার পুনর্মূল্যায়নেও বটে। তাই তিনি স্মৃতিচারণের দ্বিতীয় খণ্ডে নিজের প্রথম আমেরিকা সফরের দিনগুলিতে ফিরে গেছেন। ফিরে দেখছেন আপামর সাধারণ মানুষের উপর স্বামীজীর প্রভাবের দিকটি :

''বিবেকানন্দও এই সময়টিতে আমেরিকায় ছিলেন, যদিও তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। কারণ তিনি সেসময় নিউইয়র্ক শহর থেকে অনেক দূরে ছিলেন, আর সেটিই ছিল আমার কর্মকেন্দ্র। কিন্তু বিচার-বৈদগ্ধ্য ও নৈতিকতার যে আন্দোলন তিনি সেই মহাদেশে সৃষ্টি করেছিলেন তার অভ্রান্ত চিহ্ন আমি দেখেছি।"[১৪]

একই স্মৃতিকথার অন্যত্র বিপিন পাল এক অসামান্য ঐতিহাসিক মূল্যায়ন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই লিখনের মধ্যে শুধুমাত্র তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নির্যাসটুকুই নেই, আছে এক পরিণামদর্শী মানুষের গভীর বিশ্লেষণ। এই কাজ করতে গিয়ে প্রথমে তিনি বিদেশে ব্রাহ্ম প্রচারকদের কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেছেন :

''ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের বৈদেশিক প্রতিনিধি হিসেবে প্রথমে কেশব সেনকে ব্রিটেনে পাঠান। পরে কেশব সেনের সহকারী প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা দুজায়গাতেই পাঠানো হয়। কিন্তু আদতে কেশবের প্রচারিত বাণী ছিল ইউনিটারিয়ান খ্রিষ্টীয় বাণীরই সংশোধিত রূপ। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রিটিশ ও আমেরিকান শ্রোতাদের সামনে যা বলেছেন তাও সেই একই বাণী। না কেশব, না প্রতাপচন্দ্র—কেউই নিজের দেশের মানুষের প্রাচীন চিন্তাধারা বা ধর্মীয়

অনুভূতির বিষয়ে যথেষ্ট সুপরিচিত ছিলেন না। তাঁরা দুজনেই ছিলেন সেই শিক্ষা ও আলোকের বাহক যা ব্রিটিশ-শাসক আমাদের জন্য নিয়ে এসেছিলেন।"[১৫]

অতঃপর আমরা দেখব কালের যাত্রাপথ বিপিন পালের মানসপটে স্বামী বিবেকানন্দের কোন চিত্র পুনর্নির্মাণ করে দিয়েছিল। তাঁর স্মৃতিকথার অংশ :

"বিবেকানন্দ তাঁর দুর্জয় সাহসের দ্বারা আমেরিকার মানুষের কল্পনার জগতটি অধিকার করেছিলেন। (সেদিক দিয়ে) কেশব বা প্রতাপ ছিলেন হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গে মোটামুটি ক্ষমাপ্রার্থী। কারণ তাঁদের জ্ঞান অনুযায়ী হিন্দুধর্মের না ছিল কোনও উচ্চবর্গের নীতিশাস্ত্র, না কোনও গভীর আধ্যাত্মিকতা—মূলত সবটাই ছিল মূর্তিপূজা, বহু-দেবতাবাদ, এবং বর্ণভেদ। বস্তুত সেই সময় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার এই ছিল সার্বিক ধারণা। তাঁর নিজধর্ম সম্বন্ধে এমত ব্রিটিশ ও আমেরিকান মূল্যায়নের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দই প্রথম প্রশ্ন তুললেন। তাঁর আমেরিকান শ্রোতারা অকস্মাৎ বিস্ময়গ্রস্ত হলেন, তাঁদের এতদিনের লালিত দৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্বসংস্কার একটি বিপুল ধাক্কার সম্মুখীন হল। ধর্মমহাসভার জনাকীর্ণ গ্যালারির সামনে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিবেকানন্দের বাণীর মধ্য দিয়ে সভ্যমানুষের আত্মশ্লাঘার প্রতি যে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল না কোনও জড়তা, কোনও সংশয়ী ক্ষমাপ্রার্থনা, কোনও বিশদ সাফাই, অথবা কোনও হীনমন্যতার লেশ। বিবেকানন্দ কোনও কারণ দর্শাননি, নিজের অবস্থান নিয়ে কোনও যুক্তির অবতারণা করেননি, তিনি শুধু মানুষের অন্তরাত্মায় প্রতিধ্বনিযোগ্য সরল ও সোজাসুজি ভাষায় তাঁর বাণী পেশ করেছেন—ঠিক যেমনটি করতেন আমাদের দেশের প্রাচীন মুনি-ঋষিরা, যেমনটি করতেন ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রফেটরা—কারণ চিরসত্য সর্বদাই তর্কাতীত ও অখণ্ডনীয়। শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের সাফল্যের অন্তরালে এই ছিল সার কথা, এই সাফল্যের অবশ্যম্ভাবী প্রতিঘাত ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিল—এবং সেটি এই দেশে হিন্দুধর্ম পুনর্জাগরণের শক্তি জুগিয়েছিল।"[১৬]

কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মীয় পুনর্জাগরণের উল্লেখ করে বিপিন পাল ক্ষান্ত হননি। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের উৎসমুখ 'স্বদেশি আন্দোলন'-এর অন্যতম কাণ্ডারি তিনি, তাই নিজের অভিজ্ঞতার আলোয় স্বামী বিবেকানন্দের আর একটি অনস্বীকার্য অবদানের প্রতিও তিনি স্বীকৃতি জানিয়েছেন :

"একজন শক্তিশালী বাগ্মী এবং স্বদেশের মানুষের ধর্মের রক্ষক হিসেবে তাঁর (বিবেকানন্দ) বিস্ময়কর সাফল্য অব্যবহিত সময়ে ভারতবর্ষে একটি অসাধারণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল—আমাদের মধ্যে সদ্যোদ্ভূত জাতীয়তার চেতনায় এক নতুন শক্তি ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে দিয়েছিল। বস্তুত এটিই ছিল আমাদের প্রথম বৈদেশিক অভিযান।"[১৭]

এই রচনা এখানেই সমাপ্ত হতে পারত। কিন্তু তা যে হল না তার কারণ জীবনের অন্তিমবর্ষে বিপিন পাল আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন—বিশেষত এবারে তিনি স্বামীজীর প্রসঙ্গে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাও বললেন। সেখান থেকে কিছু প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তির সংকলন জরুরি। জরুরি প্রধানত এই কারণে যে ম্যাক্সমুলার লিখিত 'The Life of a Mahatman' প্রবন্ধ এবং পরে তাঁরই রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ইউরোপে প্রকাশিত হওয়ার পর নববিধান ব্রাহ্মসমাজের বাদ-প্রতিবাদ ও তৎসংক্রান্ত উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বিপিন পাল।

চার

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার

অ্যালবার্ট হলে, অধুনা যেটি কফি হাউস হিসেবে পরিচিত, রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসব পালন করেন। সেই উপলক্ষ্যে বক্তৃতা প্রদানের জন্য বিপিনচন্দ্র পাল আহূত হয়েছিলেন। কিন্তু এ-ব্যাপারে তাঁর প্রতিকূল শারীরিক অবস্থা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তিনি তাঁর ভাষণের লিখিত রূপ সভায় পাঠিয়ে দেন। লেখাটি সেই বছরেই জুলাই মাসে 'Prabuddha Bharata' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১৮] তারই অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে লেখা শেষ করব। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে স্বামীজীর পারস্পরিক সম্পর্কটিকে 'Organically bound up' বা আঙ্গিকগতভাবে অবিচ্ছেদ্য উল্লেখ করে বিপিন পাল লিখছেন :

''আধুনিক মানুষ পরমহংসকে বুঝতে পারবে শুধুমাত্র বিবেকানন্দের ভিতর দিয়ে এবং বিবেকানন্দের মাধ্যমে, এমনকী বিবেকানন্দকেও বুঝতে প্রয়োজন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিত বা আলো।... শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মহান এক আধ্যাত্মিক শক্তি।... যে-প্রজন্মের সময়কালে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন তাদের মধ্যে কল্পনাশক্তির (যে-কল্পনাশক্তি সকল আধ্যাত্মিকতার প্রাণস্বরূপ) অভাব ছিল। তাদের কাছে তাই তিনি দুর্জ্ঞেয় ছিলেন। এই কারণেই বিবেকানন্দের উপর দায়িত্ব বর্তেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মা ও বাণীর মর্মোদ্ধার করে সেটি এই প্রজন্মের কাছে বোধগম্য রূপে উপস্থাপিত করার।... বিবেকানন্দের রূপান্তরের কাহিনি আজও অনুচ্চারিত। আমি জানি না এই অলৌকিক ঘটনা কীভাবে ঘটেছিল সেটি কেউ জানেন কি না। বিবেকানন্দ ছিলেন একজন যুক্তিবাদী মানুষ, সেইসঙ্গে Deist বা প্রত্যাদেশে অবিশ্বাসী ঈশ্বরবাদী—যদিও নিজেকে তিনি Atheist বা আস্তিক বলে ভাবতেন। তাঁর প্রাথমিক ধর্মীয় সংসর্গ ঘটেছিল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে। সাধু-সন্তের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ওঠার পক্ষে তাঁরা খুব একটা সহানুভূতিপূর্ণ ছিলেন না। তা সত্ত্বেও নিজের আত্মশক্তি ও বিশেষত তীব্র ঈশ্বরপ্রেমের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস ব্রাহ্মসমাজের বহু সদস্যকে নিজের কাছে আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই কখনও পরমহংসের অন্তর্জগতের প্রেমস্রোত ও আধ্যাত্মিক অর্জন-অনুভূতির হদিশ পেতে সক্ষম হননি। তাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন বৈদগ্ধ্যের তিন-পলা কাঁচের মধ্য দিয়ে। তাই তাঁদের বেশিরভাগের কাছেই পরমহংস তাঁর অন্তরের ঈশ্বরভক্তির গোপন কক্ষটি খোলেননি। এইদিক দিয়ে বিবেকানন্দকে তিনি কৃপা করেছিলেন।''

বিপিন পাল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে আদানপ্রদানের কাহিনিটির কথাও জানিয়েছেন :

''বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেও জানতেন না কীসের সে আকর্ষণ। এটি ছিল সেই সংঘটন যাকে আত্মশক্তির প্রয়োগ বলা হয়। যখন একটি আত্মা অপর একটি আত্মাকে আধ্যাত্মিকতার গহীন স্তরে স্পর্শ করে, তখন সেই দুটি আত্মাই আধ্যাত্মিকতার অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়—অভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। গুরু শিষ্যের ভিতর দিয়ে এবং তারই মাধ্যমে কাজ করে যান—শিষ্য বুঝতেও পারেন না যে তিনি গুরুর সুরেই নাচছেন। মানুষ একেই বলেন অনুপ্রেরণা। বিবেকানন্দের কর্মকাণ্ড তাঁর অন্তর্জগতের রূপান্তরের পরেই ঘটেছিল।... তাই যদিও বিবেকানন্দ-বাণীর মূলে রয়েছে পরিচিত বৈদান্তিক অনুধ্যানের আলো—আসলে সেটি আধুনিক মানুষের প্রতি তাঁর গুরুরই বাণী।''

বিপিন পালের এই শেষোক্ত দাবি তর্কাতীত, কারণ এটি ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন গুরু-শিষ্য-পরম্পরার স্বীকৃত ইতিহাস। তবে স্বামীজীর একটি উক্তি এ-প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য। ইংল্যান্ডের

'ওয়েস্টমিনস্টার গেজেট' সংবাদপত্রের প্রতিনিধির কাছে ১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাসে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন : ''আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রাদির উপর আমার গুরুদেব যে আলোকপাত করেছিলেন তারই সাহায্যে তাদের মধ্য থেকে আমি যে অর্থাদি আহরণ করতে পেরেছি সেটিই আমার প্রদত্ত শিক্ষার উৎস।''[১৯] আর একটি বিশেষ দিনের কথা স্মরণ করি, সেদিন তাঁর নিজ শহরের শুধুমাত্র অভিজাত শ্রেণি নয়, আপামর মানুষ কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে সমবেত হয়েছিলেন স্বামীজীর সংবর্ধনার উদ্দেশ্যে। সমগ্র পরিবেশ আলোড়িত আনন্দ আর আবেগে। সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত তরুণ সন্ন্যাসী সেদিনও বলেছিলেন একই কথা—তবে হৃদয়ের ভাষায়। শ্রীরামকৃষ্ণকে আপন শিক্ষক, গুরু, হৃদয়ের নায়ক, আদর্শ ও ভগবান অভিধায় অভিষিক্ত করে তিনি বললেন, ''আমার চিন্তাদি, উচ্চারিত বাক্য, অথবা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমি যদি কোনও কিছু অর্জন করে থাকি, আমার মুখনিঃসৃত একটিমাত্র বাক্যও যদি এ বিশ্বের কোনও একজন মানুষের সাহায্যে এসে থাকে—তার কোনও কিছুতেই আমার কোনও দাবি নেই, সবকিছু (প্রাপ্য) তাঁরই।''[২০] ✠

তথ্যসূত্র

১। Bipin Chandra Pal, *Memories of My Life and Times* (Modern Book Agency : Calcutta, 1932), p. vii [Hereafter, *Memories*]

২। Surendranath Banerjee, *A Nation in Making* (Humphrey Milford, OUP, London, 1925), p. 222

৩। David Hardiman, *The Nonviolent Struggle for Indian Freedom*: *1905-19* (Penguin Random House: Gurgaon, 2018), pp. 28-29

৪। ibid, p. 210

৫। Subhas C. Bose, *The Indian Struggle: 1920-1934* (Wishart & Company : London, 1935), p. 336

৬। *Memories*, p. 229

৭। Bipin Chandra Pal, *Mrs Annie Besant: A Psychological Study* (Ganesh & Co. : Madras, 1917), pp. 12-14

৮। Bipin Chandra Pal, *Memories of My Life and Times* (Yugayatri Prakashak : Calcutta, 1951), Vol. II, p. 135 [Hereafter, *Memories of My Life and Times*]

৯। ibid, p. 171

১০। ibid, p. 147-48

১১। ibid, p. 207-208

১২। Eds: Sankari Prasad Basu and Sunil Bihari Ghosh, *Vivekananda in Indian Newspapers 1893-1902* (Basu Bhattacharyya & Co. : Kolkata, 1969), p. 367

১৩। Ed. Sankari Prasad Basu, *Swami Vivekananda in Contemporary Indian News (1893-1902),* (RMIC : Kolkata, 1997), vol. I, p. 208

১৪। Bipin Chandra Pal, *Memories of My Life and Times*, vol. II, p. 277

১৫। ibid, p. 275

১৬। ibid, p. 276-77

১৭। ibid, p. 274-75

১৮। Bipin Chandra Pal, *Ramakrishna and Vivekananda*, Prabuddha Bharata (Mayavati, Advaita Ashrama), pp. 323-25

১৯। *Complete Works of Swami Vivekananda* (Advaita Ashrama : Kolkata, 1989), vol. 5, p. 186

২০। Ibid, vol. 3, p. 312